গ্রামীণ
জীবন ও ঐতিহ্য

মুহম্মদ আব্দুস সামাদ

প্রান্ত প্রকাশন
১

প্রথম প্রকাশ: একুশে বইমেলা-২০২৫

উৎসর্গ

মোতাহির আলী চৌধুরী কনা স্যার, আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু

স্যারের শাসন, উৎসাহ, অনুপ্রেরণা আর সহযোগিতা আমাকে বিদ্যালয়মূখী থাকতে বাধ্য করেছিল। শ্রেণিপাঠের বাইরেও আমি ছিলাম স্যারের অবৈতনিক ছাত্র।

রওশন আরা বেগম, আমার জন্মদাত্রী মা

এগারোটি সন্তান জন্ম দেওয়া আর লালনপালন করার মাঝে আমার বেড়ে ওঠাকেও তিনি পরম যত্নে আগলে রেখেছিলেন। শৈশবের খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার সময়ে উনি আমার শৌখিন চাহিদাকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন।

মনোয়ারা বেগম

তাঁর কাছ থেকে আদর-স্নেহ আর প্রশ্রয় পেয়ে থাকি।
আত্মিকভাবে তিনি আমার কাছে মাতৃস্থানীয়া।

ভূমিকা

এই বইটি বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনের এক নিখুঁত ও বাস্তব চিত্র তুলে ধরে, যেখানে লেখক তাঁর শৈশবের স্মৃতির স্তূপ সাজিয়ে, গ্রামবাংলার সামাজিক রীতি-নীতি, সংস্কৃতি, সম্পর্ক এবং ঐতিহ্যের নানা দিক পাঠকের সামনে নিয়ে এসেছেন। লেখকের নিজের অভিজ্ঞতা, বিশেষ করে বিজয়া বাজারের মতো এক সাধারণ গ্রামীণ বাজারের অভ্যন্তরীণ জীবন এবং সেই সমাজের নানা চরিত্র ও ঘটনার বর্ণনা তাঁর শৈশবের দিনগুলোর সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

লেখক তাঁর গল্পের মাধ্যমে বিষদভাবে তুলে ধরেছেন গ্রামীণ সমাজের নানা বিষয়, যেমন নানা চরিত্র, মানুষের সম্পর্ক, এবং দৈনন্দিন জীবনের ছোট ছোট মুহূর্ত। এখানে গ্রামীণ বাজারের চরিত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে কাছিব মিয়া, যিনি সবসময় নিজের কাজে ব্যস্ত থাকেন, ডাঃ গফুর চাচা, যিনি গ্রামের চিকিৎসক হিসেবে পরিচিত, করমুছ মিয়া এবং দয়া দাদা, যিনি সবসময় কাউকে না কাউকে সাহায্য করতে চান। এসব চরিত্র শুধুমাত্র এক একটি মানুষের পরিচয় নয়, বরং তারা গ্রামের প্রথা, বিশ্বাস এবং জীবনের বাস্তবতা ও সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তোলে।

গ্রামের বাজারের এসব চরিত্রের মাধ্যমে লেখক দেখিয়েছেন, কীভাবে এক সাধারণ গ্রামীণ বাজার মানুষের জীবনের নানা দিককে প্রভাবিত করে। বিজয়া বাজারে, নির্বাচনের সময়ের উত্তেজনা, মাছের বাজারের কাণ্ডলীলা, ছেলেধরা কুসংস্কারের ভয় এবং গ্রামের প্রতিদিনের অভ্যন্তরীণ জীবনের অতি সাধারণ কিন্তু অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ এখানে উঠে এসেছে। প্রতিটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরের সম্পর্ক, সামাজিক কুসংস্কার এবং মানুষের জীবনের সংগ্রাম প্রকৃতির সাথে একযোগ হয়ে ফুটে উঠেছে।

বইটিতে গ্রামীণ জীবনযাত্রার আরো কিছু দিক তুলে ধরা হয়েছে, যেমন– গ্রামের কুসংস্কার ও শিশুর মধ্যে ভয়ের সৃষ্টি– বিশেষ করে 'ছেলেধরা' অথবা 'খুচকরের' গল্প, যা গ্রামীণ সমাজে একটা নির্দিষ্ট সময়ে ভয় এবং সন্দেহের সৃষ্টি করেছিল। এ ধরনের কুসংস্কারগুলো সমাজের ভেতর মানুষের মধ্যে

সম্পর্কের অস্থিরতা তৈরি করত। তবে লেখক এখানে সামাজিক পরিবর্তনের দিকে এক সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়েছেন, যে পরিবর্তন গ্রামীণ জীবনের ঐতিহ্য এবং বিশ্বাসের সঙ্গে মিশে ছিল।

প্রকৃতির প্রতি মানুষের সম্পর্কও এক গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে উঠে এসেছে। যেমন, গ্রামাঞ্চলে রাতের আকাশে জোনাকি পোকার আলো, পোকামাকড়ের আলো জ্বালানোর ঘটনা, গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, এসব কাহিনিতে লেখক গ্রামীণ জীবনের সরলতা এবং একান্ত সম্পর্কের দিকে মনোযোগ দিয়েছেন। সেই সময় বিদ্যুৎ ছিল না, টর্চলাইটের ব্যবহার ছিল, যা গ্রামীণ জীবনযাত্রায় এক ধরনের অনুষঙ্গের মতো ছিল। গ্রামবাসীরা কীভাবে প্রযুক্তি ও আধুনিকতার অভাবের মধ্যেও জীবন সংগ্রাম চালাত, সেই ছবিটি এখানে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

এছাড়া, লেখক গ্রামীণ শ্রমজীবী আর কর্মজীবী মানুষের কঠোর পরিশ্রম এবং তাদের জীবনযাত্রার বাস্তবতা সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন। শনের ছাউনি তৈরি, বাঁশের বেড়া এবং কাঁদামাটির ঘর তৈরি– এইসব পুরনো পেশা ও কৌশল গ্রামীণ জীবনযাত্রার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। তবে আধুনিক যুগের প্রভাব গ্রামীণ সমাজে ধীরে ধীরে এসব ঐতিহ্যকে বিলীন করে ফেলছে, যা লেখকের চিন্তা-ভাবনায় এক গভীর দাগ ফেলে।

বইটিতে গ্রামীণ জীবনযাত্রা এবং সমাজের পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপট নিয়ে কিছু মূল প্রশ্নও উঠেছে– যেমন, কীভাবে গ্রামীণ সমাজের ঐতিহ্য, পেশা, কর্মধারা এবং প্রথাগুলো আধুনিক সমাজে বিলীন হয়ে যাচ্ছে এবং এটি ভবিষ্যতে কীভাবে প্রভাব ফেলবে। লেখক এই দিকটি বিস্তারিতভাবে অন্বেষণ করেছেন, যাতে পাঠক উপলব্ধি করতে পারেন। আমাদের গ্রামীণ জীবনের মূল্যবোধগুলো আধুনিকতার ছোঁয়ায় কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে। একদিকে যেমন গ্রামাঞ্চলের কর্মচঞ্চলতা, কৃষি নির্ভর সমাজের সম্পর্ক এবং মানুষদের অকৃত্রিম সংগ্রাম উঠে এসেছে, তেমনি আধুনিকতাও গ্রামীণ সমাজের ঐতিহ্য ও সম্পর্কের সঠিক মূল্যায়নকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

এছাড়া, লেখক একটি বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন সামাজিক শ্রেণিবিভাজন এবং গ্রামীণ অর্থনীতির ওপর ভিত্তি করে মানুষের যাপন। যেমন, যে পরিবারে

আটা খাওয়া হতো, তাদের গরীব বলে মনে করা হতো, আর যে পরিবারে ভাত খাওয়া হতো, তাদের অভিজাত বলে গণ্য করা হতো। এটি সেই সময়কার সমাজের একটি স্পষ্ট চিত্র, যেখানে সামাজিক শ্রেণিবিভাজন ছিল খুব শক্তিশালী।

চায়ের দোকান– যেখানে গ্রামবাসীরা একে অপরের সাথে দেখা করত, আড্ডা দিত, চিন্তা-ভাবনার নতুন দিগন্ত খুলত। এটি ছিল গ্রামাঞ্চলের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। চায়ের কাপ হাতে, সেই আড্ডা যেন এক যুগের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেখানে গড়ে উঠত সম্পর্ক, আসত হাসি-কান্নার মিশ্রণ এবং নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা। গ্রামীণ সমাজের সামাজিক যোগাযোগের এই মাধ্যমটি লেখকের গল্পের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক হয়ে উঠেছে।

এই বইটি কেবল একটি সময়ের, একটি সমাজের, একটি জীবনযাত্রার গল্প নয়, এটি মানবিক মূল্যবোধ, সামাজিক শ্রেণি এবং জীবনযাত্রার সংগ্রামের এক গভীর বিশ্লেষণ। লেখক দেখিয়েছেন, কীভাবে পুরনো রীতি ও জীবনধারা পরিবর্তিত হচ্ছে এবং আধুনিক সমাজের প্রবাহের সঙ্গে একে একে হারিয়ে যাচ্ছে। এটি শুধু একটি অতীতের স্মৃতি নয় বরং বর্তমানের সমাজের আক্ষরিক প্রতিচ্ছবি। যা আমাদের চিন্ত-ভাবনায় গভীর প্রভাব ফেলে।

এই বইটি আমাদের অতীতের জীবনযাত্রা, সম্পর্ক এবং মূল্যবোধের গুরুত্ব উপলব্ধি করাতে সহায়তা করবে এবং কীভাবে এ সমস্ত ঐতিহ্য আধুনিক সমাজে হারিয়ে যাচ্ছে, তার ওপর প্রশ্ন তুলে দেবে। লেখক এই গ্রামীণ জীবন এবং তার সম্পর্কের প্রভাব নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন, যা পাঠককে অতীতের মূল্যবোধ এবং বর্তমানের পরিবর্তনের মধ্যে একটি সম্পর্ক খুঁজে বের করার সুযোগ দেয়।

– মুহম্মদ আব্দুস সামাদ

লেখকের প্রকাশিত বই

১. আবাদির চোখে আফ্রিকা
২. দুন্দুবুড়ি
৩. কষিত কাঞ্চন
৪. ডেকাপীর বুড়ো হাজাম এবং অন্যান্য
৫. কিছু শোনা কিছু দেখা হৃতদিনের ঋণে লেখা

গোয়ালা আসতেন দই নিয়ে। বাঁশের টুকরিতে খড় বা ধানের কুড়া বিছিয়ে তার ওপর যত্ন করে রাখা দইয়ের পাতিলগুলো নিয়ে বাড়ি বাড়ি হাজির হতেন গোয়ালা। বেতের টুকরিতে খড় দিয়ে সযতনে সাজানো দইয়ের পাতিলগুলো ঢেকে দিতেন কলার পাতা দিয়ে। আর প্রতিটা পাতিলের সাথে কলার পাতা বেঁধে দিতেন কলার পাঁচলের বেত দিয়ে। দইয়ের ওপরের মালাইয়ের পরত দেখে লোকজন দই কিনতেন। পরত যত পুরু, সেই দইয়ের চাহিদাও তত বেশি। ক্রেতারা বারবার জিজ্ঞেস করে নিয়ে নিশ্চিত হতে চাইতেন যে, গুঁড়া দুধ দিয়ে দই বসানো হয়নি। দশ টাকায় এক পাতিল দই পাওয়া যেত তখন। অসাধারণ ভালো স্বাদের দই ছিল ওগুলো। সেই স্বাদ এখন হারিয়ে গেছে, নাকি আমার স্বাদের ধরন পালটে গেছে, উত্তর জানা নেই।

মজার ব্যাপার হলো, আমি যে সত্তর-আশির দশকের গ্রামীণ সময়টার কথা বলছি, তখন দোকান থেকে দই কিনে খাওয়ার প্রচলন ছিল না বললেই চলে। আর গ্রামীণ অর্থনৈতিক বাস্তবতায় গ্রামের বেশিরভাগ মানুষের স্থানীয় শহরে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ত কালেভদ্রে। হয়তো শহরের মিষ্টির দোকানে দইও বিক্রি হতো, তবে সেটা কেনার সামর্থ্য গ্রামের দুই-এক পরিবার ছাড়া কারো ছিল না। সেটা আমার শৈশবের অভিজ্ঞতায় বলতে পারি বেশ জোর দিয়েই।

আমাদের পাশের গ্রাম নোয়াঁগাওয়ের শরাফত আলী (ছদ্মনাম) দাদার ছেলে গিলমান (ছদ্মনাম) চাচা দুধ সংগ্রহ করে বেচতেন। তাকে আড়ালে অনেকে দুধ গিলমান বলত। গ্রামে একাধিক গিলমান থাকায় হয়তো এই নামকরণ। উনার একটা বড় অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি ছিল। পাটের রশি দিয়ে বানানো সুন্দর শিকার মধ্যে ঝোলানো হাঁড়িটা হাতে করেই বেশিরভাগ সময় নিয়ে বাজারে যেতেন গিলমান চাচা। মাঝেমধ্যে লম্বা লাঠির আগায় পাতিলটি বেঁধে কাঁধে করেও নিয়ে যেতেন। গিলমান চাচা সারা গ্রাম ঘুরেঘুরে দুধ সংগ্রহ করতেন। কুলাউড়া শহরে নিয়ে সেই দুধ বিক্রি করতেন তিনি। গ্রামে প্রায় সবাই দেশি জাতের গাভি পালতেন। এসব গরু দুধ তেমন দিত না। এক-দেড় সেরের বেশি দুধ দেওয়া গাভি খুব কমই ছিল। তাই অনেক বাড়ি ঘুরে উনাকে দুধ সংগ্রহ করতে হতো। পায়ে হেঁটেই যেতেন তিনি প্রায় সাত কিলোমিটার দূরের কুলাউড়া শহরে। অবশ্য গ্রাম থেকে শহরে পদব্রজেই যেতে হতো তখনকার সময়ে। রাস্তা ছিল, তবে গাড়ি চলার উপযোগী ছিল না একদম।

রেড কাউ, ডিপ্লোমা, ডানো আর এনকোর গুঁড়া দুধের বাজার তখন বেশ বিস্তার লাভ করেছে। আর সেই ধারাবাহিকতায় অজ পাড়াগাঁয়েও কৌটার দুধ পৌঁছে গেছে। দোকানগুলোতে এসব গুঁড়া দুধের বড় বড় খালি টিন শোভা পেত। আমি চেরাগ ভাইয়ের দোকান থেকে একবার দুধের একটা বড় খালি টিন কিনেছিলাম। যতদূর মনে পড়ে ওটা এনকোর দুধের খালি কৌটা ছিল। কেন কিনেছিলাম সেটা মনে নেই। আমার ধারণা সুন্দর রং দেওয়া নিউজিল্যান্ড এর দুধ কোম্পানির এই টিন আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। এখন শিশুদেরকে খাওয়ানোর জন্য বিশেষায়িত আলাদা দুধ বাজারে বিক্রি হয়। টেলিভিশন আর নানা বিজ্ঞাপনের সুবাদে মানুষ এগুলো সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। তখনো এসব খাবার ছিল, কিন্তু গ্রামের মানুষের অজানা ছিল। কারো সামর্থ্য থাকলে শিশুদেরকে কৌটার এসব সাধারণ দুধই কিনে খাওয়াতেন। বেশিরভাগ মানুষেরই আলাদা করে দুধ কিনে বাড়ন্ত শিশুকে খাওয়ানোর সামর্থ্য ছিল না।

তবে দইয়ের কারবারিরা বেশিরভাগই ছিলেন সনাতন ধর্মাবলম্বী। গোয়ালা মানেই সনাতনী ধর্মাবলম্বী আদি ঐতিহ্যবাহী পেশা। গোয়ালারা বেতের টুকরিতে করে দইয়ের ভাঁড় নিয়ে আসতেন। খড়ের ওপরে সুন্দর

করে সাজানো মাটির ঘটিগুলো সাজিয়ে রাখতেন তারা কলাপাতায় মুখ বেঁধে। কলার পাঁচল দিয়ে বেঁধে রাখতেন সুন্দর করে ঘটির কাইড়ের সাথে। খরিদ্দারকে আলতো করে পাতার বাঁধন খুলে গোয়ালা গভীর মমতায় দেখাতেন দইয়ের সর। খদ্দের বারবার জিজ্ঞেস করে জেনে নিতেন পাউডার দুধ দিয়ে বানানো দই কি না। তখনকার সময়ে গুঁড়া দুধ মাত্র জনপ্রিয় হওয়া শুরু হয়েছে। গুঁড়া দুধ নিয়ে মানুষের মধ্যে নানান ধরনের আজগুবি ধারণা প্রচলিত ছিল। গ্রামের মানুষ চা ছাড়া আর কিছুতে গুঁড়া দুধ ব্যবহার করতেন বলে দেখিনি তখনকার সময়ে। অবশ্য গ্রামে দইয়ের ক্রেতা খুব কমই ছিল।

অবশ্য খাঁটি দুধ নিয়ে এই বিতর্ক আদিকালের। দুধের চাহিদা আর জোগানের ভারসাম্যহীনতা সবসময়ই ছিল। উন্নয়ন অধ্যয়নে স্নাতকোত্তর পড়ার সময় অতিথি শিক্ষক হিসেবে মাঝেমধ্যে আসতেন অবসরপ্রাপ্ত আমলা, অর্থনীতিবিদ ড. আকবর আলী খান। তিনি ১৯৭০ সালে হবিগঞ্জে চাকরি করা কালীন এই দুধে ভেজাল মেশানো নিয়ে একটা অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করেছিলেন। তিনি বলেন, ১৯৭০ সালে তিনি ছিলেন হবিগঞ্জের এসডিও। দুধে পানি মেশানোতে রাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী গোয়ালাদের শাস্তি দিলেন তিনি, আশা করেছিলেন অন্যরা সতর্ক হবেন। এরপর আবিষ্কার করলেন হবিগঞ্জে দুধে ভেজালের মাত্রা বহুগুণ বেড়েছে। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়েই আকবর আলি খান দেখতে পেলেন দুধে পানি মেশানোতে বেচারা গোয়ালার দায় সামান্যই, বরং কড়া আইন ও জরিমানার ভয় দেখিয়ে প্রশাসনের বহু মানুষ গোয়ালাকে আরও বেশি ঘুস দিতে বাধ্য করেন। বোঝা গেল, দুধে পানি মেশানোর ইতিহাস পুরনো।

অবশ্য ক্রমে বিদেশি জাতের অধিক দুগ্ধদানকারী গাভি পালন শুরু করেন মানুষ। দুধের জন্য গাভি পালনের খামার বিকশিত হয়। দুধের জোগানে বেশ গতি আসে। তবে দুধে পানি বা ভেজাল মেশানোর এই পুরনো বিতর্ক এখনো সগৌরবে টিকে আছে।

গ্রামের বাড়িগুলোতে ফেরি করে বিক্রি করার জন্য মুড়ি নিয়ে আসতেন কেউ কেউ। মুড়ি বিক্রেতাদের বেশিরভাগই ছিলেন গ্রামীণ নারী, বিধবা বা নানান কারণে একা হয়ে যাওয়া নারীরা। তারা নিজেরা মুড়ি ভাজতেন, বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিক্রি করতেন।

আমাদের বাড়িতে একটা মুড়ির টিন ছিল। সবসময়ই টিনে মুড়ি ভরে রাখা হতো। গ্রামের সব বাড়িতেই মুড়ির কদর ছিল। আমার পর্যবেক্ষণ মতে, গ্রামের মানুষ অনেক বেশি চাপ্রেমী ছিল। তার একটা কারণও থাকতে পারে। আমাদের এলাকা চা বাগান ঘেরা আর রেশনের সাথে পাওয়া চা পাতা আর চোরাই চা পাতা কমমূল্যে পাওয়া যেত এলাকায়। সহজলভ্যতা হয়তো চাখোর বৃদ্ধির একটা কারণ ছিল। আর চায়ের সাথে মুড়ি বরাবরই একটা অন্যতম জনপ্রিয় অনুষঙ্গ। গ্রামের প্রায় সবাই মুড়ি কিনে টিনে ভরে মজুত করতেন। জলখাবার বা সকালের নাশতা এই চা মুড়ি দিয়ে চলে যেত অনেক সময়।

আমাদের গ্রামের পশ্চিমে একটা পাড়া ছিল। এখনো সেটা আছে। শতকরা পঁচিশ ভাগেরও বেশি সনাতনী মানুষের বসবাস আমাদের এলাকায়। আমাদের অঞ্চলে এক পাড়া মুসলমান হলে আরেক পাড়া হিন্দু। হিন্দু পাড়ায় সবাই হিন্দু। এদিকে মুসলমান পাড়ায় সবাই মুসলমান। আমাদের গ্রামের হিন্দু পাড়ার এক বয়স্ক ভদ্রমহিলা ছিলেন, যিনি মুড়ি বেচতেন। তিনি মুড়ি ভেজে বস্তায় ভরে নিয়ে আসতেন। তার বেতের তৈরি একটা পরিমাপক ছিল মুড়ি মাপার জন্য। আমরা বলতাম কাঠি। বেশি মুড়ি কিনতে চাইলে কাঠি দিয়ে মেপে বেচতেন কাকি। আর কম কিনতে চাইলে সেটার পরিমাপক ছিল আলাদা। নারিকেলের খোলকে সুন্দর করে কেটে রাখতেন সাথে। আমরা বলতাম নারিকেলের ঠালি। ঠালি দিয়ে মেপে মুড়ি বিক্রি দিতেন যারা কম কিনতেন তাদেরকে।

পাড়ার এই কাকির মুড়ির কদর ছিল বেশি। উনি বালু গরম করে খোলায় মুড়ি ভাজতেন। বাজারে যেসব মুড়ি পাওয়া যেত সেগুলো মেশিনে ভাজা। আর অনেক মোটা মোটা। মানুষের সন্দেহ ছিল মুড়িকে মোটা করার জন্য ইউরিয়া সার মেশানো হয়। তাই বাজারের মোটা মুড়ি কিনতে মানুষের অনীহা ছিল। মানুষ কাকির মুড়িতেই আস্থা রাখতেন।

গুড় মিশিয়ে বানানো মুড়ির মোয়ার বেশ চাহিদাও ছিল বেশ। বিশাল পলিথিনের বস্তায় ভরে কারিগররা মোয়া নিয়ে আসতেন। তারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফেরি করে বিক্রি করতেন মোয়া। কমবেশি সবাই মোয়া কিনতেন। মা-চাচিরা বয়ামে বা টিনে ভরে এগুলো রেখে দিতেন। রান্না করতে দেরি হলে বা বাচ্চারা খাওয়ার জন্য কান্না করলে এগুলো দিয়ে তাদেরকে শান্ত করতেন তারা। বাড়িতে পড়শিরা এলে এই মোয়া দিয়ে আপ্যায়ন করতেও দেখা যেত। চিড়ার মোয়াও পাওয়া যেত। ওগুলোর দাম একটু বেশি ছিল। চিড়ার মোয়া বেশ শক্ত হতো। তবে ভারি মজার স্বাদের ছিল ওগুলো। দোকান থেকে এক টাকা দরে চিড়ার শক্ত মোয়া খেয়ে খেয়ে বাড়ি ফেরার সময়টা পার করে দিয়েছি কত শতবার!

শৈশবের দিনগুলোতে গ্রামের বাড়িগুলোতে খই এর বেশ কদর ছিল। মাথায় বা টুকরিতে করে গ্রামের বাড়িগুলোতে কেউ কেউ খই নিয়ে আসতেন বিক্রির জন্য। তারা এগুলো ফেরি করে বিক্রি করতেন। হরেকরকম খই পাওয়া যেত। ধানের খই এর সাথে চিনি মেশানো থাকত। গুড় মেশানো খইও পাওয়া যেত। ওগুলো জমাট বেঁধে থাকত। তিলের খই সম্ভবত সবচেয়ে মজার ছিল। ওটার দামও একটু বেশি ছিল। শাপলার খইও পাওয়া যেত। একটু দামি হলেও শাপলার খই এর বেশ কদর ছিল। তিল বা শাপলার খই গুড় মিশিয়ে জমাট বাঁধানো থাকত। ছুরি দিয়ে কেটে বড় বড় চাকা পত্রিকার কাগজে মুড়ে দিতেন বিক্রেতারা। বিভিন্ন পার্বণে বা উৎসব-মেলায় বিশাল বিশাল খই এর চাকা নিয়ে পসরা সাজাতেন দোকানিরা। মেলায়-পার্বণে খই যেন এক অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ।

আজকের এই দিনে এসে দেখি বিদেশি বেনিয়ারা আমার গোয়ালা, মুড়িওয়ালা কাকি, খইওয়ালা প্রান্তিক কারবারি, দুধের ব্যবসায়ী শরাফত

আলী চাচাদের ব্যবসা দখল করে নিয়েছে। আমার পরিচিত এই মানুষগুলো তাদের ব্যবসা পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছেন। তাদের ব্যবসার কলেবর বৃদ্ধি পায়নি উলটো হারিয়ে গেছে। মানুষ এখন আর পাটালি গুড় কিনে না। বিদেশ থেকে আমদানি করা গুঁড়ো দুধ দিয়ে বানানো মিষ্টি কেনে। মুড়ি, মোয়া কিনে না, চিপসের প্যাকেট কেনে। দুর্গম আর প্রত্যন্ত গ্রামে চিপসের চকচকে মোড়ক চোখে পড়ে। গোয়ালা হারিয়ে গেছেন তার পূর্বপুরুষের পেশা সাথে নিয়ে। তার জায়গা দখল করেছে পুঁজিবাদী ধনিক আর অসাধু বেনিয়ারা।

পুঁজিবাদ আর সাম্রাজ্যবাদের কঠিন জালে আটকা পড়ে আমরা পুঁজিবাদের দাস হয়ে গেছি। দিনকে দিন পুঁজিবাদীদের ব্যবসা টিকিয়ে রাখার শ্রমিকে পরিণত হয়েছি আমরা। চাকচিক্যময় জীবনের হাতছানিতে মজে গেছি সবাই। আদি আর স্বাস্থ্যকর সকল চর্চা হেলায় বাদ দিয়ে অকাতরে গ্রহণ করেছি মেশিন নির্ভর অস্বাস্থ্যকর সব পন্থা। এই প্রক্রিয়ায় আর পৃথিবীর বিরাশি ভাগ সম্পদ মাত্র একভাগ মানুষের কবজায় তুলে দেওয়ার জন্য আর তা টিকিয়ে রাখার জন্য দিনরাত প্রাণপণ খেটেই চলেছি আমরা। আমাদের নিরন্তর সাধনা যেন পুঁজিবাদের গোলাম হয়ে থাকা!

ধনী আরও ধনী হচ্ছে। গরিব আরও গরিব হচ্ছে। বৈষম্য বাড়ছে প্রতিনিয়ত। মানুষের চাহিদাও বাড়ছে লাগামহীন। কীসের পিছনে ছুটছে মানুষ, সে নিজেও জানে না। মানুষের মধ্যে ভর করেছে সীমাহীন লোভ। কোথায় থামতে হবে বা গন্তব্য কোথায় সেটা জানা নেই আমাদের। অজানার পথে ছুটছে সবাই। এই নিরন্তর গোলামি খেটে জীবনের সব স্বাদ আহ্লাদ বিসর্জন দিয়ে পড়ন্ত জীবনে এসে ক্লান্ত হয়ে নিজেকে প্রতারিত ভাবছে মানুষ। কিন্তু বোধোদয় যখন হয় তখন বড্ড বিলম্ব হয়ে যায়, শোধরানোর সুযোগ আর থাকে না।

বাজারের সময় ছাড়া বাজারস্থলটি যেন প্রাণহীন এক কংকাল। আমাদের এলাকার সকল বাজার বসতো সন্ধ্যায় আর চলত রাত দশ-সাড়ে দশটা পর্যন্ত। বাজারের সময় ছাড়া অন্য বেলায় বাজারের পাশ দিয়ে গেলে বাজারের শনের ছাউনি দেওয়া বাঁশের কাঠামোর ঘরগুলোকে নিস্তব্ধ, নিরানন্দ আর করুণ লাগত। বাজারগুলোর এই রূপ দেখে কল্পনাও করা যাবে না যে, বাজারবেলায় ঘরগুলো কেমন সরগরম আর প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

স্থায়ী ব্যবসায়ীদের নিজস্ব ভিটা থাকত বাজারে। সেই ভিটায় বানানো জীর্ণ-শীর্ণ ঘরগুলো যুগের পর যুগ একই রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যেন মহাকালের সাক্ষী হয়ে। ভরা বর্ষায় ঘরের ছাউনি বৃষ্টির ঝাপটা সামলাতে পারত না বাজারের অধিকাংশ দোকানঘরগুলো। স্থায়ী দোকানগুলোতে বৃষ্টির সময় বাজারের সকল মানুষের জায়গা হতো না। বৃষ্টির ঝাপটা থেকে বাঁচতে শনের এই ভিটাগুলোতে গিয়ে দাঁড়ালে বৃষ্টি থেকে বাঁচা যেত না তেমন, বরং নির্ঘাত ভিজতে হতো।

তবে বাজারগুলোতে কিছু স্থায়ী দোকানও ছিল। সেগুলোতে মানুষ মুদি জিনিস কিনতেন। প্রতিটা বাজারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ চায়ের স্টল। চায়ের দোকান থাকত বেশ কয়েকটা। পুরো বাজারজুড়েই চা স্টল দিয়ে ঘেরা বললে ভুল হবে না। সেই স্টলগুলোতে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আড্ডা জমতো।

আমি যে এলাকায় আমার শৈশব ও কৈশোর কাটিয়েছি, সেটা দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটা পাহাড়ি জনপদ। প্রাকৃতিকভাবে বেড়ে ওঠা বাঁশ ও গাছের মহাল অধ্যুষিত। আমাদের এলাকায় যারা পাহাড় থেকে বাঁশ আর গাছ কেটে এনে জীবিকানির্বাহ করতেন, তারা এই বাঁশ-কাঠ সংগ্রহ করতে যাওয়া আসার পথে গ্রামের বাজারগুলোর এই চায়ের স্টলগুলোতে বসে বিশ্রাম নিতেন। চায়ের সাথে বিস্কুট অথবা বনরুটি চুবিয়ে খেতেন তারা।

চায়ের সাথে ধূমপানও চলত দেদারসে। পানসুপারি খাওয়ার ব্যবস্থাও থাকত এই চায়ের স্টলগুলোতে। জিনিসপত্রের বাজারদর ছিল খুবই সাশ্রয়ী। দুই টাকা চায়ের কাপ, এক টাকা একটা বনরুটি আর পঞ্চাশ পয়সা এক খিলি পান। হরেকরকম জর্দা আর মশলা মিশিয়ে চায়ের স্টলগুলোতে বসে পান চিবাতে দেখা যেত লোকজনকে।

আমার শৈশবের সময়টাতে যে বাজারগুলোর কথা বলছি, সেই বাজারের ঝুপড়ি ঘরগুলোতে বৈদ্যুতিক বাতির কোনো ব্যবস্থা ছিল না। কুপির আলোয় চলত কেনাবেচা। কেরোসিনের এই কুপিগুলো থেকে একটা কালো ধোঁয়ার শিস বের হতো। বাজারে গেলে সবসময় কুপিগুলোর এই শিস আড়াল করে দাঁড়াতাম আমি। বেশ তীব্র আর ঝাঁজালো ছিল কুপির সেই শিস। আড়াল করে দাঁড়াতাম ওটার ধোঁয়ার গন্ধ সহ্য হতো না বলে। বাজারগুলোতে বিদ্যুতের ব্যবস্থা না থাকলেও চা বাগানগুলোতে অবশ্য বিদ্যুৎ ছিল। চা বাগানের আশেপাশের গ্রামগুলোতে বিদ্যুৎ ছিল না। বিদ্যুতের আলোর ঝলকানি না থাকার অসুবিধা থাকলেও অন্ধকারের বুক চিরে জেগে থাকা টিমটিমে আলোর কুপির আলো এই চরাচরে এক অনন্যসাধারণ নৈসর্গিক আবহ তৈরি করত। বিশেষ করে অন্ধকার রাতে বাজারের কুপির আলো এক মায়াবী পরিবেশ তৈরি করত। দূর থেকে দেখলে হাট-বাজারগুলোকে ঘন গাছপালায় আচ্ছাদিত একেকটা দ্বীপ মনে হতো।

বাজার ফেরত মানুষের হাতে থাকত কাচের বোতল। এই ছোট ছোট শিশির গলায় দড়ি লাগানো থাকত ঝুলিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এই বোতলগুলোতে করে কেরোসিন আর রান্নার তেল নিয়ে ফিরতেন সবাই। গ্রামে বিদ্যুৎ না থাকায় কেরোসিনই ছিল আলো জ্বালানোর একমাত্র ভরসা। বিভিন্ন মাপের বোতলে মানুষকে কেরোসিন কিনতেন। কুপিও কিনতে পাওয়া যেত গ্রামের বাজারে। পিতলের খাঁজকাটা একটা কুপি খুব জনপ্রিয় ছিল ঐ সময়ে। গ্রামের মানুষেরা অবশ্য নিজেরাই কুপি বানিয়ে নিতেন। কাচের বোতল বা পুরনো টিনের কৌটায় পাটের আঁশের বা পুরনো সুতি কাপড়ের সুতলি দিয়ে বানানো কুপিই বেশি ব্যবহৃত হতো। বেশিরভাগ মানুষই সন্ধ্যা হওয়ার সাথে সাথেই খাওয়াদাওয়া করে শুয়ে পড়তেন। কেরোসিন খরচ করে বাতি জ্বালিয়ে রাত জাগার মতো বিলাসিতা করার সামর্থ্য বেশিরভাগ মানুষেরই ছিল না।